কামাল চৌধুরী'র মুক্তি ও স্বাধীনতার কবিতা : স্বদেশ চেতনা

মুক্তি ও স্বাধীনতার কবিতা
কামাল চৌধুরী
প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স
প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
প্রকাশকাল : জুলাই ২০১২
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৪ ॥ মূল্য : ১০০ টাকা

কামাল চৌধুরীর জন্ম ১৯৫৭ সালে। লেখালেখিতে তাঁর হাতেখড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়। নিয়মিত লিখছেন সত্তর দশকের শুরু থেকে। ১৯৭৪ সালে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে সমকালীন কাব্যজগতে প্রবেশ। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতাগ্রন্থ 'মিছিলের সমান বয়সী'। পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ আজো প্রতিবাদী তারুণ্যের স্পর্ধিত কাব্যভাষার প্রতীক। এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে ১৫টি গ্রন্থ। সম্পাদনা করেছেন 'অজস্র আগুনের ফুল' নামে সত্তরের দশকের কবিদের কবিতা। পেশা সরকারি চাকরি। জীবনযাপনের কোলাহলের ভেতরেও কবিতাই তাঁর সঙ্গোপন সাধনা। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গদ্যও লিখেছেন, তা-ও কবিতা বিষয়ক। কবিতার বাইরে উৎসাহী-সমাজ সংস্কৃতি অধ্যয়ন ও গবেষণায়। পিএইচ.ডি করেছেন নৃবিজ্ঞানে– 'বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতি-সম্পর্ক ও মাতৃসূত্রীয় আবাস প্রথা' নিয়ে।

এক অস্থির ও প্রতিকূল সময়ের স্বতন্ত্র কবিকণ্ঠ কামাল চৌধুরী। জাতীয় জীবনের সামগ্রিক সংকট ও অনিকেত বাস্তবতার ক্রান্তিকালে কামাল চৌধুরীর রক্তাক্ত পঙ্‌ক্তিমালা তারুণ্যের দ্রোহকে জাগিয়ে তোলে সাহসী ও স্পর্ধিত ভাষায়। নতুন বিন্যাসে পৃথিবী গড়তে চেয়েছেন; কথা বলেছেন হত্যার বিরুদ্ধে; খুলে দিয়েছেন প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোশ; স্বপ্ন দেখেছেন বৈষম্যহীন এক সমাজের-অপ্রেমিক মানুষের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে জয়গান গেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ, আবহমান বাংলা, বাঙালি ও শাশ্বত প্রেমের। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন সময়ের প্রাতিস্বিক অনিবার্য কণ্ঠস্বর।

'ষাট দশকের বাংলাদেশের কবিতা শুধু সংখ্যায় নয় বৈচিত্র্যেও সমৃদ্ধ ও গতিময়। প্রেম প্রকৃতি লোকাচার আর দেশজ উপাদানের সঙ্গে এখানে একই সঙ্গে দ্রোহ আর সমাজচেতনা হাত ধরাধরি করে চলেছে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ একটা জাতির সত্তাকে কিভাবে আলোড়িত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে এই পর্বের কবিতা তারই পরিচয়বাহী। রাষ্ট্রীয় জীবনের সংকটক্ষণে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন এই সময়ের কবিরা, আত্মগত কবিতা যাঁদের পছন্দ ছিল তাঁদের পক্ষেও অনিবার্য ছিল সময়ের টানে স্বদেশচেতনা আর সমাজভাবনাকে কবিতায় ভিত্তিমূলে স্থাপনা দেওয়া। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনকে বুঝে নেওয়ার এ ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না এই সময়ের কবিতার। নতুন এক জীবন অভিজ্ঞতায় ষাট দশকের কবিতা বৈচিত্র্যে ও জীবনবীক্ষায় বাংলাদেশের কাব্যজগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।'

'বাহান্নর ভাষা আন্দোলন পর্বে সত্তর দশকের অধিকাংশ কবি অতি শৈশবে, অনেকের জন্ম তার আট-দশ বছর পরে। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সময়ে এঁরা অনেকে সদ্য যৌবনে, বেশ

বড় সংখ্যকের তখন কৈশোর জীবন। এঁদের মধ্যে দু-একজন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও সত্তর দশকের কবিদের সামগ্রিক অর্থে বলা যায় বাংলাদেশের বিপ্লবোত্তর যুগের সন্তান। কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের রেশ রয়ে গেছে সমাজে। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতির জনকের হত্যা এবং পরবর্তী কয়েক দশকের টালমাটাল সামাজিক অবস্থায় আবর্তিত হতে হতে এঁরা নিজেদের বিশ্বাসের জমি তৈরি করেছেন নিজের মতো। বাইরের রাজনৈতিক উত্থান-পতনে এঁরা অনেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা সোচ্চার হয়েছেন। আবার অনেকে আত্মমুখ পরিক্রমায় আত্মলীন থেকেছেন। বাঙালির সহজাত রোমান্টিক আবহে নিজ কবিসত্তাকে অনেকে আবিষ্কার করেছেন নতুন ভাবে। এ দশকের কবিদের স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা এঁদের কবিতার প্রবণতা অনুসারে এই সময়ের কবিতাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করছি।'

১. সমাজ-রাজনীতি;
২. রোমান্টিকতা;
৩. আত্মমুখিনতা।

'কামাল চৌধুরীর কবিতা মেধা নির্মিত। তাঁর চেতনা নগরবিমুখ তখন তাঁর ভাষ্য- 'এ শহরে বৃষ্টি হলে আমি হারানোর ঢিলায় চলে যাই'। ভারি চমৎকার ছবি তৈরির হাত তাঁর, 'দিদির মত শান্ত দিঘি'-র খোঁজ পেয়ে যান তিনি। তাঁর তীব্র ইতিহাস চেতনার সঙ্গে মিশে থাকে স্বদেশচেতনা। 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় লেখেন :

গ্রেনেড উঠেছে হাতে ... কবিতার হাতে রাইফেল
এবার বাঘের থাবা, ভোজ হবে আজ প্রতিশোধে
যার সঙ্গে যে রকম, সেরকম খেলবে বাঙালি
খেলেছি, মেরেছি সুখে ... কান কেটে দিয়েছি তোদের।

এসেছি আবার ফিরে... রাত জাগা নির্বাসন শেষে
এসেছি জননী বঙ্গে স্বাধীনতা উড়িয়ে উড়িয়ে...

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফসল হলেও, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্ম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুরু হয়। বস্তুত, ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত, বায়ান্ন-র ২১ ফেব্রুয়ারি তার উচ্চকিত প্রকাশ। এরপর চুয়ান্ন-র নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছিষট্টির ৬-দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের ১১-দফাভিত্তিক গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে চেতনা বিপুল সম্ভাবনার দ্বার-উন্মোচন করে। ১৯৭০-এর নির্বাচন বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়।

এতো কিছু সংঘটিত হলেও পশ্চিমা শোষকশ্রেণি হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। এ বিজয়কে ধ্বংস করার জন্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নজিরবিহীন গণহত্যা শুরু করে। কিন্তু বাঙালি নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রবণতাগুলোকে কয়েকটি পর্যায়ে চিহ্নিত করা যায়-- এক. বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদী চেতনা, দুই. ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা, তিন. সাম্যবাদী চেতনা, চার. গণতান্ত্রিক চেতনা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চরম বিজয় সাধিত হলেও স্বাধীনতা-উত্তর পঁচিশ বছরে সে চেতনার দেখা দিয়েছে তীব্র সংকট। বাংলাদেশের সাহিত্য তার প্রভাব নানাভাবে উদ্ভাসিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রবণতাসমূহ বাংলাদেশের সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকে যে প্রভাব ফেলেছে এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালির

সমাজ জীবনে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের যে বিস্তর ও অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে তা উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন কামাল চৌধুরী।

'দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মধ্যবিত্তশ্রেণির যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্বের প্রত্যাশা ছিলো দৃপ্ত, তা সাতচল্লিশ-উত্তর অব্যবহিতকাল পরেই টানাপোড়েনে পর্যবেসিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দেয় রাষ্ট্রভাষা ও পাকিস্তানি তত্ত্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিতর্ক। এই সাংস্কৃতিক বিতর্ক পরে রাজনৈতিক কার্যক্রমের ফসল হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতি সাংস্কৃতিক আবহে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্ববাংলায় প্রথমে সংগঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও স্বাধিকার আন্দোলন। পরে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন। স্বাধীনতার আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে একাত্তরের ষোলে ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এইসব আন্দোলন বাংলাদেশের মানুষের জীবনাচারে প্রভাব ফেলেছে বিভিন্ন মাত্রিকতায়। পাশাপাশি সাহিত্য ধারারও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নতুন বৈশিষ্ট্যে। বাংলাদেশের কবিতার ধারাটিও এর ব্যতিক্রম নয়।'

'মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালেও কবিতা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করেছে, আত্মস্থ করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও পরিবেশ পরিস্থিতি। বাংলাদেশের সত্তর ও আশির দশকের–আবিদ আনোয়ার (১৯৫০), আবিদ আজাদ (১৯৫০), খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০), সৈয়দ হায়দার (১৯৫০), শামীম আজাদ (১৯৫১), শিহাব সরকার (১৯৫২), রবীন্দ্র গোপ (১৯৫২), নাসির আহমেদ (১৯৫২), বিমল গুহ (১৯৫২), মাসুদুজ্জামান (১৯৫২), মাহবুব বারী (১৯৫২), ইকবাল হাসান (১৯৫৩), আবু মাসুম (১৯৫৩), মাহবুব হাসান (১৯৫৪), সোহরাব হাসান (১৯৫৪), হাসান হাফিজ (১৯৫৫), মোহাম্মদ সাদিক (১৯৫৫), হালিম আজাদ (১৯৫৫), জাহাঙ্গীর ফিরোজ (১৯৫৫), আশরাফ আহমেদ (১৯৫৫), তসিকুল ইসলাম (১৯৫৫), জাহিদ হায়দার (১৯৫৬), গোলাম কিবরিয়া পিনু (১৯৫৬), মোহন রায়হান (১৯৫৬), নাসিমা সুলতানা (১৯৫৭), কামাল চৌধুরী (১৯৫৭), সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (১৯৫৮), আসলাম সানী (১৯৫৮), ফরিদ কবির (১৯৫৯), মিনার মনসুর (১৯৬০), সরকার মাসুদ (১৯৬০), মহীবুল আজিজ (১৯৬১), রেজাউদ্দিন স্টালিন (১৯৬২), মারুফ রায়হান (১৯৬২), মারুফুল ইসলাম (১৯৬৩), আনিসুল হক (১৯৬৫), সুহিতা সুলতানা (১৯৬৫), সাজ্জাদ আরেফিন (১৯৬৫) প্রমুখ।

কবিরাও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা ও চেতনাকে মর্মমূলে ধারণ করে লিখেছেন অনেক কবিতা।

মুক্তিযুদ্ধের আগে পূর্ববাংলার কবিতায় স্পষ্টত বুর্জোয়া মানবতাবাদী এবং মার্কসবাদী এই দুই ধারা বিদ্যমান ছিলো। শুধু তাই নয়, এই দুটি ধারা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা কবিতাগুলোর একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলো। যাকে বাংলাদেশের জাতীয় চৈতন্যের জাগরণমূলক কবিতার ঐতিহ্য বলা চলে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধ যেমন আলাদা সত্তার বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে অর্থাৎ দিয়েছে স্বাধীনতা, বাংলাদেশ এবং জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মমর্যাদা, তেমনি বাংলাদেশের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব রাজনৈতিক কবিতা হিসেবে স্বাতন্ত্র্যের যাত্রা সূচিত করেছে। কেননা–

মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর প্রেক্ষপট নির্মাণে একটি দেশের জাতীয় সংস্কৃতি পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি যেমন একটি দেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামকে

ত্বরান্বিত করতে পারে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্নাত হয়ে সে দেশের শিল্প সাহিত্যও যুগান্তকারী নতুন সৃষ্টিতে হয় ক্ষুব্ধ। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি নির্মাণে রুশো-ভলটেয়ার মন্টেস্কুর চেতনা সঞ্চারী রচনাবলী যেমন প্রেরণা যুগিয়েছেন; তেমনি মানবসভ্যতাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়া যে রুশ বিপ্লব (১৯১৭)-তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন টলস্টয়, তুর্গেনিভ গগল আর ম্যাক্সিম গোর্কি। অপরদিকে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চেতনায় স্নাত হয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ শিল্প সাহিত্য। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপট নির্মাণেও এদেশের সাহিত্য বিশেষত কবিতা পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।'

এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে কামাল চৌধুরীর ১৪টি গ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থ : 'মিছিলের সমান বয়সী' (১৯৮১), 'টানাপোড়েনের দিন' (১৯৯১), 'এই পথ এই কোলাহল' (১৯৯৩), 'এসেছি নিজের ভোরে' (১৯৯৫), 'এই মেঘ বিদ্যুতে ভরা' (১৯৯৭), 'নির্বাচিত কবিতা' (১৯৯৮), 'ধূলি ও সাগর দৃশ্য' (২০০৩), 'রোদ বৃষ্টি অন্ত্যমিল' (২০০৩), 'হে মাটি পৃথিবী পুত্র' (২০০৬), 'প্রেমের কবিতা' (২০০৮), 'পান্থশালার ঘোড়া' (২০১০), 'মুক্তি ও স্বাধীনতার কবিতা' (২০১২)। কিশোর কবিতা: আপন মনের পাঠশালাতে (২০০৭)।

তাঁর 'মুক্তি ও স্বাধীনতার কবিতা' কাব্যগ্রন্থটি জুলাই ২০১২ খিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা। এই কাব্যে ৩৯টি কবিতা আছে। কবিতাগুলির নাম : জন্মের প্রার্থনা, জন্মদিনের কবিতা, ক্রাচের যুবক, রক্তাক্ত পঙক্তিমালা, সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল, টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে একটি উজ্জ্বললাল, হৃদয়াস্ত্র, তোমার মৃত্যুর কথা মনে হলে, জাতীয়তাময় জন্ম-মৃত্যু, মুক্তি ও বিপ্লব-এর কবিতা, এক দশক, প্রতিশোধ, তোরা সব ভালোবেসে, হাসান হাফিজুর রহমান স্মরণে, দেশ, শহীদ জননী, একুশে ফেব্রুয়ারি, মুক্তিযোদ্ধা, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, সাহসী জননী বাংলা, বীরের এ রক্তস্রোত, সকলেই যোদ্ধা নয়, সুফিয়া কামাল স্মরণে, সুপ্তিভঙ্গকাল, পতাকা, অভয় মিনার, যুদ্ধশিশু, একাত্তর, শামসুর রাহমান স্মরণে, আজ ফিরে পেতে এসেছি প্রবেশাধিকার, কাঁটাতার, ভ্রমরের মৃত্যুলেখা, আকাশ না থাকলে, সভ্যতার মৃত্যু, লালকমল, পাখি শিকারের আগে, বিজয়ী আকাশ, নিয়াজি যখন আত্মসমর্পণ লিখছে।

কাব্যগ্রন্থটি কবি পরম শ্রদ্ধায় উৎসর্গ করেছেন বাঙালির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মানুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি এ মহানায়ককে স্মরণ করেছেন বা তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

'টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে', 'সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল', 'তোমার মৃত্যুর কথা মনে হলে', 'জাতীয়তাময় জন্ম-মৃত্যু', '১০ জানুয়ারী ১৯৭২', 'সাহসী জননী বাংলা', 'বীরের এ রক্তস্রোত', 'নিয়াজি যখন আত্মসমর্পণ লিখছে' প্রভৃতি কবিতায়। টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে কবিতায় কবি জাতির জনক হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন :

হে আমার স্বাধীনতার মহান স্থপতি
মহান প্রভুর নামে আমার শপথ
সেই সব বৃদ্ধদের প্রতি আমার শপথ।
সেই সব ভাই বোন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি আমার শপথ
আমি প্রতিশোধ নেব
আমার রক্ত ও শ্রম দিয়ে
এই বিশ্বের মাটি ও মানুষের দেখা
সবচেয়ে মর্মস্পর্শী জঘন্য হত্যার আমি প্রতিশোধ নেব।

যারা এক সময় জাতির জনকের চারদিকে ছিলেন তারাই আবার তাঁর নির্মম হত্যার পরে সেবা-দাসীদের মতো নতুন মনিবকে ঘিরে আছে। কবির কথায়–

মহান মানব ছিলে তুমি – দেবতা তো কখনো ছিলে না
দেবতা বানিয়ে যারা স্তুতি করেছে তোমার
জনসভা সেমিনারে বহুবার জীবন দিয়েছে
তোমার মৃত্যুর পরে
তারা কেউ আমাদের সাথে নেই আজ
সেবা-দাসীদের মতো তারা সব ঘিরে আছে নতুন মনিব
হায়এ রকম অপকর্ম শুধু বুঝি বাঙালির সাজে।

কবি জাতির জনকের খুনিদের জন্ম নিয়েও কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন। কবির প্রশ্ন খুনিরা কোনো দেশের হয়ে জাতির জনককে হত্যা করেছে ষড়যন্ত্রী হয়ে।

তোমার নিকটে ছিল যারা সেইসব তোমার খুনিরা
তারা কি বাঙালি ছিল?
নাকি কোন ষড়যন্ত্রী দেশের সেবক?
সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজেদের বিকিয়েছে যারা
আমাদের ভাই নয় তারা
আমাদের জাতিসত্তা প্রেম আর ঐতিহ্যের হাজারো কাহিনি
ভুলে গিয়ে তারা সব বিদেশের সেবক হয়েছে!

আমার সমস্ত ঘৃণা থুথু আর বুকের আগুন
বাঙালি নামক ঘৃণ্য খুনিদের প্রতি।

'তোমার মৃত্যুর কথা মনে হলে' কবিতার কবি জাতির জনকের কাছে তার ঋণের কথা স্বীকার করেছেন :

তোমার মৃত্যুর কথা মনে হলে
তোমার জন্মের কাছে ঋণী হয়ে যাই।
আমি এক ব্যথিত কুমার
তোমার মৃত্যুর নামে আজীবন বেদনাতাপিত থাকি
অন্তঃস্থ হৃদয়জুড়ে নেমে আসে লাল লাল স্রোত
রক্তক্ষরণের মতো তীব্র এক বিক্ষুব্ধ ধারায়
সে বেদনা কান্না হয়।
সমুদ্র স্রোতের মতো জলোচ্ছ্বাস নেমে আসে
পাহাড় পাথর ভেঙে শিরা মাংস সব এলাকায়
আমার শরীরজুড়ে লেগে থাকে
সবটুকু লবণাক্ত বেদনার ভাগ।
আমি এই বেদনায় হাত রেখে কাঁদি
জল চোখে একজন ব্যথিত তরুণ হয়ে
তোমার জন্মের কাছে ঋণী হয়ে যাই
আজীবন শ্রদ্ধাভরে নতজানু থেকে
প্রিয় সেই জন্মকে লালন করি ভেতরে ভেতরে।

জাতির জনকের জন্ম-মৃত্যুকে কবি জাতীয়তাময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি 'জাতীয়তাময় জন্ম-মৃত্যু' কবিতায় লেখেন :

রক্ত দেখে পালিয়ে গেলে
বক্ষপুরে ভয়
ভাবলে না কার রক্ত এটা
স্মৃতিগন্ধময়
দেখলে না কার জন্ম-মৃত্যু জাতীয়তাময়।

মুক্তি ও বিপ্লব-এর কবিতা'য় কবি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন। এই যুদ্ধে আমাদের কী অর্জন তা উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের এত বছর পরেও আমরা যে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারিনি তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন :

আঠারো বছর পরে
বিপ্লবের সন্তানেরা আজ কৈশোর-উত্তীর্ণ
মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আজ আমাদের স্বাধীন পতাকা
যে আবেগ স্ফীত ছিল জননী জঠরে
আজ তার সবটুকু অন্তর্হিত
বিপন্ন বিস্ময়ের এ অস্থির সময়
কালি মেখে দিয়ে গেছে জাতির আবেগে।

আমাদের বিপ্লবেরা আজ স্বপ্নহীন
মুক্তিরা আকাঙ্ক্ষাহীন!

'প্রতিশোধ' কবিতায় কবি ঘাতকের প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি এ জীবনে যদি প্রতিশোধ নিতে নাও পারেন তবে কবির আশা :

অনেকের চোখে বনভোজনের নেশা
ভুলে যেতে চায়, আমি তবু ভুলব না
এই পথ ছেড়ে যারা যাবে যায় – যাক
একা হয়ে যাব নিঃস্ব হব না তবু
ছাড়ব না আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

এক জীবনে যদি বা ব্যর্থ হই
এই তলোয়ার পুত্রকে দিয়ে যাব।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে জাতির জনক ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তার স্বপ্নের স্বদেশ ঢাকায় এসে পৌছান। সে দিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে কবি ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ কবিতায় বাংলার জনগণের দীর্ঘ আশার প্রতীক বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রতীক্ষায় থাকা মানুষের মানসিক অবস্থা ও পরিবেশের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তখন :

তিনি আসলেন–মৃত্যুপুরী থেকে জেগে উঠল দেশ
মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল থেকে আতশবাজির মতো
ফুটতে থাকল উল্লাসের বুলেটবৃষ্টি।
বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত প্রতিটি সড়ক
ভরে উঠল ভালোবাসার ফুলে
বাতাসে ধ্বনিতে হল 'স্বাগতম'–চতুর্দিকে উৎসব,
চতুর্দিকে আনন্দ
চতুর্দিকে স্বাধীনতা।

তিনি ফিরে আসলেন
অগণিত মানুষের আনন্দ অশ্রু-জলে ভাসতে ভাসতে বললেন

দ্যাখো, আমি মরি নাই
তোমাদের ভালোবাসা আজ আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।

'বীরের এ রক্তস্রোত' কবিতায় কবি জাতির জনকের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে লিখেছেন :

জনক মরতে পারে, কিন্তু তাঁর চেতনা মরে না
গুলি বোমা নির্বাসন এসবের তাৎপর্য ক্ষণিক
ঘাতকেরা কাপুরুষ, অপশক্তি সহিংস কার্তুজে
নারী-হন্তা, শিশু-হন্তা – তারা ঘৃণ্য থাকে চিরকার।

তিনি আরও লিখেছেন :

সিঁড়িতে যে পড়ে থাকে, তাঁর বক্ষে নদী বহমান
সে নদী আকাশ ছোঁয়, জলবায়ু বৃষ্টি মেঘ মাটি
জননীর অশ্রু ছুঁয়ে জ্বেলে রাখে অন্তহীন দাহ
তাতে পোড়ে হত্যাকারী, ক্রীতদাস, অন্ধ, পরজীবী।

কবির চিন্তায়-চেতনায় জড়িয়ে আছে জাতির জনকের স্মৃতি। তিনি কোন মতেই ভুলতে পারেন না জাতির জনককে। তাই তিনি 'সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল' কবিতায় জাতির জনকের মুখখানি স্মরণ করে লিখেছেন–

সেই মুখখানি স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল
সেই মুখখানি মিছিলে মানব হতো
.....
সেই মুখখানি অগ্নির সাথী ছিল।
.....
সেই মুখখানি পৃথিবীর প্রেম ছিল।
.....
সেই মুখখানি আমাদের পিতা ছিল।
.....
সেই মুখখানি স্বদেশের ছায়া ছিল।
.....
সেই মৃতদেহ যুদ্ধ প্রেরণা ছিল।
.....
যুদ্ধে মিছিলে মৃত্যু বারুদে মাখা
সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল।

এই কাব্যগ্রন্থে কবি জাতির জনকের সাথে স্মরণ করেছেন এই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। একুশের শহিদদের, স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিসেনাদের এবং এদেরকে নিয়ে যারা লিখেছেন তাদেরও স্মরণ করেছেন। তিনি সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি হাসান হাফিজুর রহমান, বেগম সুফিয়া কামাল ও শামসুর রাহমানকে স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধাভরে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কবিতা লিখেছেন। 'হাসান হাফিজুর রহমান স্মরণে' কবিতায় কবি হাসান হাফিজুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন :

মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের সাহসের সঙ্গী হয়ে
একুশের ভোরের আলোয়
একদিন তুলেছেন শোকার্তের ক্ষুব্ধ তরবারি
সেই ক্ষোভ বুকে নিয়ে বাংলার শ্যামল মাটিতে
মানচিত্র খুঁজে খুঁজে অন্তহীন স্বপ্নে
যারা মেতে উঠেছিল

সেই স্মৃতি সেই সব মানুষের মুখ
আপনি তো চেয়েছেন এঁকে যেতে জীবন-সন্ধ্যায়
এই মৃত্যু – এ কি তবে স্বপ্ন অবসান?

সুফিয়া কামালকে স্মরণ করতে গিয়ে তিনি 'সুফিয়া কামাল স্মরণে' কবিতায় লিখেছেন :

আপনি থাকবেন বেঁচে, রাত যাবে, প্রদীপের সলতে ফুরাবে না
পদ্মা মেঘনা শত নদী, শত ঢেউ, জেলে নৌকা, ভাটিয়ালি
সহস্র মুক্তির গান, ধূলি ও শিশির শব্দ, সাঁঝের মায়ায়
খর্ব জাতির দেশে আপনি থাকবেন বেঁচে
দীর্ঘ এক ছায়া মহীরুহ ...।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানকে নিয়ে 'শামসুর রাহমান স্মরণে' কবিতায় কবি লিখেছেন :

সব মানুষের কাছে আমাদের ঋণ নেই, কিছু মানুষের কাছে থাকে।
কিছু মানুষেরা থাকে যাঁরা আকাশের মতো উঁচু,
অন্ধকারে অনেক অনেক চাঁদ বুকে তাঁরা বাতিঅলা
শীতে কাঁপা মানুষের কাছে তাঁরা রোদ, চাদরের দারুণ আশ্রয়
তাঁদের সবুজ ছায়া এই দুঃখী বাংলাদেশে চিরকাল বটের উপমা।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামকেও কবি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে 'শহীদ জননী' কবিতায় লিখেছেন :

পার হবো – প্রেতকুল নাচে
কালো জন্তু রক্তপায়ী দাঁত
মা তবু যে বর্ম দিলে তুমি
তার তেজে লক্ষ রুমি বাঁচে।

'মুক্তিযোদ্ধা' কবিতায় কবি মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি লিখেছেন :

তোমাদের আমি অমর কবিতা বলি
তোমাদের বলি বহমান জনধারা
নদী সমভূমি সবুজ প্রকৃতি বলি
পতাকার নিচে তোমারই গ্রহ-তারা।

কাব্যের প্রথম কবিতা– 'জন্মের প্রার্থনা'। এ কবিতায় কবি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তিনি চান তাঁর কবিতা পাঠ করুক – মৃত্যু পথযাত্রী এক বৃদ্ধ, খনি আর তাঁত কল ফেরা শ্রমিক, কোন তরুন বা পাড়াগাঁর বধূ আর কিশোরীরা বা একজন মাঝি বা কোন মুক্তিযোদ্ধারা তবেই তিনি সার্থক। তাই তিনি বলেন :

আমি সেদিন বলব
সমস্ত প্রার্থনা আজ মেষ হয়েছে
জন্মের ঋণ আমি স্বীকার করেছি।

কবি যেন এই বাংলার মাটি ও মানুষের কাছে ঋণী তাঁর জন্মের জন্য। তাই তিনি তাঁদের কথা বলতে চান, তাদের সুখে-দুঃখের সঙ্গী হতে চান। এই বাংলার মাটি ও মানুষের জন্য তিনি লিখে যেতে চান। তার কবিতা যদি সফল হয় তবেই তার মানব জন্ম সার্থক।

কবি চান এই বাংলায় এমন মানুষ জন্ম হোক, যিনি এদেশের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন। ভালোবাসবেন এদেশের প্রতিটি মানুষকে তাই কবি বলেন :

তোমার জন্মের কাছে সেই দিন নতজানু হবো
যদি তুমি কথা দাও, যদি তুমি কথা দাও
মুগ্ধ কিষানের কাছে মাটির মমতা হবে।

কবির প্রত্যাশিত ব্যক্তি হল সেই যিনি কৃষকের জন্য কাজ করবেন যিনি শস্যের জন্য, শিল্পের জন্য, আলোর জন্য, বৃষ্টির জন্য বিশেষ করে এদেশের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন। কবি তার কাছে নতজানু হবেন। কারণ :

যদি তুমি শস্য হও, শিল্প হও
যদি তুমি কথা বলো নৈঃশব্দের প্রগাঢ় ভেতরে
তোমার শেস্নাগানে যদি পৃথিবীর রোদ আসে
অন্ধকার আলো হয়, বৃষ্টি নামে দারুণ খরায়
আমি নত হবো, আমি নতজানু হবো
তোমার জন্মের নামে সেই দিন পতাকা ওড়াব।

প্রিয় বোন, প্রিয় ভাই
আমি শুধু জন্মের কাছে ঋণী, শেকড়ের কাছে ঋণী।

এ জন্যই কবি বলেন :

কবিতার কথা বলি, হত্যার বিরুদ্ধে কথা বলি
যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলি, মৃত্যুর বিরুদ্ধে কথা বলি
এই মাটি মৃত্যুহীন হোক সেই কথা বলি।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই স্বাধীনতা। যে ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা আমরা কি সেই লক্ষ্য হাছিল করতে পেরেছি? পারিনি। তাই কবি আক্ষেপ করে 'রক্তাক্ত পঙ্‌ক্তিমালা' কবিতায় লেখেন :

শহীদ মিনারগুলো দ্যাখো আজ বিষণ্ন মলিন
কালো কালো কাক এসে বসে থাকে স্মৃতির সভায়
একটি ধবল পাখি বিশোত্তর জীবনে দেখিনি
পাখি নেই জনপদে, তারা চায় সবুজ আশ্রয়
বনের আড়ালে গেলে নির্জনতা খুঁজে নেয়া যাবে
সব পাখি উড়ে গেছে, সব প্রেম সন্ত্রস্ত হরিণী
ব্যাঘ্র লালসার কাছে প্রতিদিন খুন হয়ে যায়
প্রতিদিন ভালোবাসা একা একা শুধুই পালায়।

কবি বার বার ফিরে যান বাঙালির ঐতিহ্যের কাছে। লালন ফকির, আসাদ, মনু মিয়াসহ বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের তিনি খুঁজে ফিরেন। কেননা বাঙালি জাতির যা কিছু অর্জন তা ঐসব গুণীজনদের কারণে। তাই কবি বলেন :

হাজার হাজার ঘুণ একসঙ্গে খেয়ে যায় স্মৃতি
ঐতিহ্য ভুলেছে লোকে চেনে শুধু টাকার গুদাম
ক'জন বলতে পার মনু মিয়া কোন দেশী ছিল?
ক'জন কেঁদেছে মনে একুশের শোকার্ত প্রভাতে?
শোকসভা, সেমিনার, হাস্যকর শহীদ স্মরণ!

কবি রাষ্ট্রসংকে ভেঙে পৃথিবীটা নতুন করে সাজাতে চান এবং দালালের মুখোশ খুলে দিতে চান আর যারা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের বেঁচে থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করে তাদেরকে চরম শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন :

পাথরের আঘাত করো, খুলে ফ্যালো বেণির জড়তা
ভেঙে ফেলি রাষ্ট্রসংঘ তন্ত্রমন্ত্র সামাজিক শ্রেণি
নতুন বিন্যাসে এসো তুমি আমি পৃথিবী বানাব।
তীব্র টানে খুলে দেব দালালের বিচিত্র মুখোশ
শনাক্ত হয়েছে যারা মিছিলের বিপরীতে গিয়ে
তারা আজো বেঁচে আছে, সিঁদ কাটে প্রেমিকের ঘরে
তাদের প্রাসাদে এসো জ্বেলে দেই চিতার অনল
বিষাক্ত নিশ্বাস জেনো নত হবে আমার শিখায়।

সত্যই 'কামাল চৌধুরীর কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠে বাঙালির জীবনচর্চা ও সংগ্রামের বলিষ্ঠ রূপ। একই সঙ্গে এ হয়ে ওঠে শিল্পিত প্রকরণের উজ্জ্বল প্রকাশ। বাঙালির আবহমান জীবনবোধ প্রাধান্য বিস্তার করলেও তাঁর কবিতার ব্যঞ্জনা ও চিত্রকল্প সম্পূর্ণ নিজস্ব এক চারিত্র্য নির্মাণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের মহত্তম ঘটনা। এই গ্রন্থের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ উঠে এসেছে বহুমাত্রিক দ্যোতনায়। মুক্তিযুদ্ধ-চেতনার অসামান্য ও বলিষ্ঠ রূপকার এই কবির কবিতা ধারণ করে আছে রক্তাক্ত মানচিত্রের শোক ও গৌরবগাথা যেখানে মুক্তি ও স্বাধীনতার শাশ্বত উপলব্ধি নদীর স্রোতের মতো বহমান।'

এই কবি কবিতার জন্য পেয়েছেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০১১), রুদ্র পদক (২০০০), জীবনানন্দ পুরস্কার (২০০৮), সিটি-আনন্দ আলো পুরস্কার (২০১০), আসাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্মাননাসহ (২০১১) দেশ-বিদেশ থেকে বেশ কটি পুরস্কার ও সম্মাননা। তিনি বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য ও বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

ইয়াসমীন আরা লেখা